প্রথম আলো

তারিখ ... 31 JUL 2013 ...
পৃষ্ঠা ... ১৩ ... কলাম ... ৪ ...

সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ■ তোফায়েল আহমেদ

ভর্তি নীতিমালায় সংবিধান লঙ্ঘন

সম্প্রতি *প্রথম আলোয়* কবি নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এ এইচ এম কামালের 'ইভনিং মাস্টারস নাকি ব্যবসা' শিরোনামে একটি লেখা প্রকাশিত হয়েছে। লেখাটি পড়ে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মূলধারার মাস্টার্স কোর্স নিয়ে ভিন্নতর কিছু প্রসঙ্গের অবতারণা আবশ্যক মনে হলো। মূলত তিনটি বিষয়ের মধ্যে এই আলোচনা সীমিত থাকবে। এক. বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি নীতিমালা ও ভর্তি ব্যবস্থাপনায় বৈষম্য ও অর্থ-সংশ্লিষ্টতা। দুই. মাস্টার্স কোর্সে ভর্তি বিষয়ে ভর্তি বাংলাদেশের সংবিধানপ্রদত্ত সমতার নীতির গুরুতর লঙ্ঘন এবং তিন. পাইকারি মাস্টার্স ডিগ্রি প্রদানের যৌক্তিকতা।

এক

বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তাদের ভর্তি নীতিমালা ও সামগ্রিক ভর্তি ব্যবস্থাপনায় এক দিকে নৈতিকতার সীমানা লঙ্ঘন করছে, অপর দিকে স্বায়ত্তশাসন আইন বলে নিজস্ব ভর্তিনীতির আওতায় বিভিন্ন রকম বাড়তি ফি নিয়ে পরীক্ষাসহ নানামুখী কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের জন্য বিশেষ ভাতা বা সম্মানী গ্রহণ করেছে। এটি পাবলিক ফান্ডের অপব্যবহার হিসেবে গণ্য হওয়ার পর্যায়ে পড়ে। জনপ্রতিষ্ঠান হিসেবে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ বিশেষত, যাঁরা ১৯৭৩ সালের আইনের অধীনে যে স্বায়ত্তশাসন ভোগ করেন, তা বাধাবন্ধনহীন নয়। সরকারি প্রতিষ্ঠান যেকোনো ক্লায়েন্ট থেকে যে অর্থই গ্রহণ করে থাকে, তা সরকারি অর্থ হিসেবে গণ্য। এই অর্থ ব্যয়ের যে নীতি ও নৈতিকতা—দুটিই বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি ব্যবস্থাপনায় লঙ্ঘিত হচ্ছে। একই বিশ্ববিদ্যালয়ে মূলধারার পরীক্ষায় পরিদর্শন, প্রশ্নপত্র তৈরি, উত্তরপত্র মূল্যায়ন, ফলফল টেবুলেশন ইত্যাদিতে যে পারিশ্রমিক, ভর্তি পরীক্ষার ক্ষেত্রে সে নীতি লঙ্ঘন করে পারিশ্রমিকের অঙ্ক অনেক বেশি বৃদ্ধি করা হয়। অর্থাৎ ভর্তি পরীক্ষার ফাঁদে ফেলে ভর্তির ক্ষেত্রে অধিক অর্থ পারিশ্রমিক হিসেবে গ্রহণের একটি উপায় সৃষ্টি করা হয়েছে। দ্বিতীয় যে গুরুতর অন্যায়ের প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে, তা হচ্ছে প্রতিটি বিভাগে বিশ্ববিদ্যালয়ের সব শ্রেণীর শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীর পোষ্যদের জন্য আসন সংরক্ষণ। এ বিধান সরাসরি সংবিধান স্বীকৃত সমতার নীতির সঙ্গে সাংঘর্ষিক। সংবিধানে 'সংরক্ষণ'-এর মতো বিশেষ সুবিধাটি শুধু সমাজের 'অনগ্রসর' অংশের জন্য রাখা হয়েছে। কোনো বিশেষ প্রতিষ্ঠানে কারও চাকরি করার কারণে সাধারণ নাগরিককে বঞ্চিত করে ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগতভাবে বিশেষ সুবিধা গ্রহণের বিশেষ বিধান সরাসরি অসাংবিধানিক। এখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারীর পোষ্যের জন্য বিশেষ কোনো সুবিধা প্রদান স্পষ্টতই সংবিধানপ্রদত্ত আইনের দৃষ্টিতে সমতার নীতি লঙ্ঘনের শামিল। আশা করি, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন বর্তমানে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ভর্তি নীতিমালায় কোটা পদ্ধতি ও ভর্তি পরীক্ষায় নেওয়া অর্থের লেনদেনের বিষয়টি খতিয়ে দেখবে। অন্তত দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠসমূহে আইনের শাসন ও সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা অনুসরণের ব্যত্যয় রোধে এগিয়ে আসবে।

অতিরিক্ত অর্থ আদায় করে তা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাগারে জমা না করে শিক্ষক-কর্মকর্তারা নিজেদের তৈরি নীতিমালায় তা ভাগ-বাঁটোয়ারা করেন। এই অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাগারে জমা করে নিয়মানুযায়ী সংগতিপূর্ণ পারিশ্রমিক নিলে বাকি অর্থে বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রীবৃদ্ধি ও শিক্ষা-সুবিধা বৃদ্ধি করা যেত। বর্তমানে যে পদ্ধতিতে ভর্তি পরীক্ষার অর্থ বণ্টন করা হয়, তা গুরুতর আর্থিক অনিয়মের পর্যায়ভুক্ত বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। আশা করি বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত শিক্ষক-প্রশাসকেরা বিষয়টি মূল্যায়ন করে দেখবেন।

দুই

সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠদান ও মূল্যায়নের পদ্ধতিতে পুরোপরি একই পদ্ধতি অনুসরণ না করা হলেও ডিগ্রির সময়কাল নির্ধারণ অন্তত সমতা বা সর্বজনীনতা স্বীকৃত। এখন দেশের সব বিশ্ববিদ্যালয়ে চার বছরের স্নাতক (সম্মান) কোর্স পড়ানো হয়। তা ছাড়া সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক শিক্ষক এখন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্ণকালীন শিক্ষকতায় নিয়োজিত হচ্ছেন। তা ছাড়া খণ্ডকালীন শিক্ষকতা রীতিসিদ্ধ ব্যাপার। কিন্তু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের অভিগম্যতার ক্ষেত্রে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের নীতি ও বিধিবিধান বৈষম্যমূলক। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের চার বছরের স্নাতক সমাপ্তকারী শিক্ষার্থী ইচ্ছা করলেই সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে একই বিষয়ের স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে ভর্তিপ্রার্থী হতে পারেন না। ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, জাহাঙ্গীরনগর, শাহজালাল, খুলনা সর্বক্ষেত্রে একই বিধান। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী কোনো শিক্ষার্থী সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে এমফিল ও পিএইচডিতে ভর্তির যোগ্যতা রাখেন না। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ এ বৈষম্যমূলক, অযৌক্তিক ও অন্যায় বিধিবিধান অনুসরণ করে যাচ্ছে। এটি কি তাদের অজ্ঞতা, উদাসীনতা কিংবা অতিমাত্রায় রক্ষণশীলতা—ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। তবে তা নিঃসন্দেহে অসাংবিধানিক এবং সাধারণ নাগরিক অধিকার খর্বকারী। একসময় স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে দুই ধরনের ডিগ্রি ছিল। স্নাতক পর্যায়ে ডিগ্রি (পাস) ও স্নাতক (সম্মান)। আর স্নাতকোত্তর পর্যায়ে এক বছরের মাস্টার্স সম্মানসহ স্নাতক উত্তীর্ণদের জন্য এবং দুই বছরের মাস্টার্স ডিগ্রি ছিল দুই বছরের ডিগ্রি পাস উত্তীর্ণ স্নাতকদের জন্য। বিশ্বব্যাপী স্নাতক শিক্ষার সঙ্গে তাল রেখে আমাদের ব্যবস্থাকে পরিবর্তন করা হয়েছে।

> বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকেই প্রথমে এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করতে হবে। নিজেদের পোষ্যদের জন্য বিশেষ আসন সংরক্ষণ স্বায়ত্তশাসন আইনে অপব্যবহার। একইভাবে মাস্টার্স, এমফিল ও পিএইচডি কোর্সে ভর্তির সুযোগ উন্মুক্ত না করাও সমতার নীতির লঙ্ঘন। তা ছাড়া পাইকারি মাস্টার্স ডিগ্রি প্রদানের ক্ষেত্রেও নতুনভাবে চিন্তা করা উচিত

এখন ধীরে ধীরে চার বছরের স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রিই বিশ্ববিদ্যালয় তথা উচ্চশিক্ষার টার্মিনাল ডিগ্রি হিসেবে স্বীকৃত। চিকিৎসা, প্রকৌশল ও কৃষিশাস্ত্র অধ্যয়নকারীদের জন্য মাস্টার্স করা ঐচ্ছিক বা শুধু পেশাগত উৎকর্ষের জন্য বিশেষায়িত ডিগ্রি হিসেবে বিবেচিত। কিন্তু সাধারণ শিক্ষার ক্ষেত্রে আমাদের সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর নিয়মনীতি এখনো আগের তিন বছরের ডিগ্রির স্থানে স্থাণু। বিশেষত সমাজবিজ্ঞান, কলা, বিজ্ঞান, ব্যবসা প্রভৃতি অনুষদে চার বছরব্যাপী স্নাতক ডিগ্রির পর মাস্টার্স না করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি যেন সম্পন্নই হয় না। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে চার বছরের স্নাতক ডিগ্রিটিই আনুষ্ঠানিক শিক্ষা সমাপনী মৌলিক ডিগ্রি হিসেবে বিবেচিত। ওই সব দেশে খুব কমসংখ্যক শিক্ষার্থী গ্র্যাজুয়েশনের পর মাস্টার্স কোর্সে ভর্তি হয়। আমাদের দেশে অনেক ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয় ও অপচয়মূলক মাস্টার্স ডিগ্রি দান ও গ্রহণের ব্যবস্থাটি নিয়ে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কোনো মূল্যায়ন আছে বলে মনে হয় না।

স্নাতক শ্রেণীতে যেমন উন্মুক্ত বিজ্ঞাপন দিয়ে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে ছাত্র ভর্তি করা হয়, মাস্টার্স কোর্সেও একই নিয়মে উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে ভর্তি করার বিধানটিই হবে যৌক্তিক ও আইনসিদ্ধ। এই ভর্তি পরীক্ষায় যেকোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের সমজাতীয় কোর্স সমাপনকারী শিক্ষার্থী ভর্তির সুযোগ পাওয়ার অধিকারী হবে। তা ছাড়া হাজার হাজার শিক্ষার্থীর স্নাতকোত্তর ডিগ্রিতে ভর্তির কি আদৌ প্রয়োজন আছে? অতীতের ধারাবাহিকতায় সরকারি-বেসরকারি নিয়োগকর্তারা যেকোনো সাধারণ কিংবা এন্ট্রি লেভেলের চাকরির জন্য স্নাতকোত্তর বা মাস্টার্স ডিগ্রি চেয়ে বিজ্ঞাপন দেন। এই চাহিদা অযৌক্তিক। পূর্বে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর দুটি ডিগ্রিই একসঙ্গে করা হতো চার বছরে। বর্তমানে চার বছরের স্নাতক (সম্মান) ব্যবস্থাটি বিশ্বজনীন স্বীকৃত ব্যবস্থা। তাই চার বছরের স্নাতকদের জন্য সর্বত্র একই নিয়োগনীতি গ্রহণের নতুন রীতি চালু করা উচিত। তাতে তাদের কর্মজীবনে অন্তত একটি বছর সাশ্রয় হয়। মাস্টার্স নিশ্চয়ই বিশেষায়িত অধ্যয়ন হিসেবেই বিবেচিত হবে। বিবেচিত হবে অতিরিক্ত যোগ্যতা হিসেবে। ঠিক তেমনিভাবে মাস্টার্সের জন্য শিক্ষার্থী বাছাইয়ের জন্য একটি স্বীকৃত স্বচ্ছ ও মানসম্পন্ন পদ্ধতি থাকা আবশ্যক। কেউ কোনো একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে চার বছরের স্নাতক ডিগ্রি করলেই তিনি সরাসরি মাস্টার্স করার যোগ্য এবং মাস্টার্স কোর্সে ভর্তি তাঁর অধিকার হয়ে যেতে পারে না।

বর্তমানে আমাদের সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ব্যবসায়িক ইভনিং মাস্টার্সের চেয়ে মূলধারার মাস্টার্স কোর্সের প্রতি আশা করি অধিক মনোযোগী হবে। মাস্টার্স কোর্সে ভর্তিকে বাণিজ্যবন্দী করে সন্ধ্যাকালীন কোর্সের নতুন জানালা খোলা সঠিক নয়। মূলধারার মাস্টার্স কোর্সে ভর্তির ক্ষেত্রে দেশের সাংবিধানিক ও মৌলিক অধিকারবিরোধী নিয়মনীতি করে স্বায়ত্তশাসনের অপব্যবহার আশা করি বন্ধ হবে। তা ছাড়া আরও একটি বিষয়ে দেশের সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় সংবিধান লঙ্ঘন করছে, তা হচ্ছে ভর্তির ক্ষেত্রে পোষ্যের জন্য আসন সংরক্ষণ। সংবিধান শুধু সমাজের অনগ্রসর ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জন্য সংরক্ষণনীতি সমর্থন করে। সুবিধাভোগীর নিজ স্বার্থে আরও সুবিধা গ্রহণ সরাসরি নাগরিক সুযোগের সমতার নীতির লঙ্ঘন।

দুর্ভাগা দেশ, এ বিষয়গুলো আদালতে চ্যালেঞ্জ হয় না এবং আদালতও স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে এসব জঘন্য সংবিধান লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করে না। দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এক ধাপ আমরা আগাতে পারব, যদি যাঁরা যে প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারী, তাঁরা ওই বিভাগের নিয়মানুগ বেতন-ভাতার বাইরে ওই সব প্রতিষ্ঠানের সেবা গ্রহণে বিশেষ সুবিধা ভোগ না করার নীতি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে থাকেন। জনপ্রতিষ্ঠান যেমন রেলওয়ে, বিমান, বিদ্যুৎ, টেলিফোন, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় তারা ওই প্রতিষ্ঠানের সেবামূল্য অন্য যেকোনো নাগরিকের সমানই পরিশোধ করবে এবং সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে বাড়তি কিছু গ্রহণ করবে না। অন্য কোনো সাধারণ নাগরিকের চেয়ে তারা ওই প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারী হিসেবে বিশেষ সুবিধা নিতে পারেন না। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকেই প্রথমে এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করতে হবে। নিজেদের পোষ্যদের জন্য বিশেষ আসন সংরক্ষণ স্বায়ত্তশাসন আইনে অপব্যবহার। একইভাবে মাস্টার্স, এমফিল ও পিএইচডি কোর্সে ভর্তির সুযোগ উন্মুক্ত না করাও সমতার নীতির লঙ্ঘন। তা ছাড়া পাইকারি মাস্টার্স ডিগ্রি প্রদানের ক্ষেত্রেও নতুনভাবে চিন্তা করা উচিত। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে উন্নত বিশ্বের ব্যবস্থাসমূহের দিকে আমরা আরও একবার তাকিয়ে নিজেদের ভ্রান্তি ও অপচয়ের দিকগুলো শোধরাতে পারি। অন্তত উন্নত ও অগ্রসর চিন্তা ও কর্মে আমাদের উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানসমূহ অগ্রগামী হবে, জাতি এটা আশা করে।

● ড. তোফায়েল আহমেদ: সাবেক অধ্যাপক, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।